BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022
Pp. 63-74

বাউল দর্শনে লালনের মানবতাবাদ : একটি পর্যালোচনা

প্রেমানন্দ মণ্ডল

প্রেমানন্দ মণ্ডল
সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
সরকারি ব্রজলাল কলেজ
খুলনা, বাংলাদেশ
e-mail: pramananda1968@gmail.com

সারসংক্ষেপ

আবহমান বাঙলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হলো লোকসঙ্গীত। আর লোকসঙ্গীতের গুরুত্বপূর্ণ শাখা বা ধারা হলো বাউল সঙ্গীত। বাউলরা তাদের সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই তাদের ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বাউল দর্শনের উৎস নিহিত হৃদয় ধর্মে। দেহের মধ্যেই আছেন অন্তরবাসী দেবতা। মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টিকারী প্রবৃত্তিসমূহকে ধ্বংস করে সোনার মানুষকে গড়তে পারলেই মনের মানুষকে পাওয়া সহজ হয়। মনের মানুষের সন্ধানে ব্রতী বাউলদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন ফকির লালন শাহ। এজন্য তাঁকে বলা হয় বাউল শিরোমণি বা বাউল সম্রাট। লালনের সাধারণ পরিচয় তিনি একজন কবি, গীতিকার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি শুধুই কবি নন, বরং জালাল উদ্দিন রুমী, আল্লামা ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের ন্যায় দার্শনিক কবি। কবিতা বা গানে কবি বা গীতিকারের আবেগ প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু লালনের গান তীক্ষ্ণ যুক্তির আশ্রয়ে রচিত হওয়ায় তা কেবল আবেগ সর্বস্ব নয়, বরং এক যুক্তিবাদী দর্শন। লালনের দর্শনে সন্নিবেশিত বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে মানবতাবাদ অন্যতম। কিন্তু তাঁর মানবতাবাদী চিন্তা তাঁর সঙ্গীতের মধ্যে কীভাবে নিহিত ও প্রকাশিত, সে বিষয় আমাদের অনেকেরই অজানা। যে মানবতাবাদী চিন্তার জন্য লালন অধিকতর মহিমান্বিত হওয়ার দাবী রাখেন, নিবন্ধটি সে বিষয়েরই একটি পর্যালোচনা ।

গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলার ভাবান্দোলনের প্রাণপুরুষ, লোকদর্শনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব, বাউল শিরোমণি লালনের মানবতাবাদের স্বরূপ-সম্ভাবনা এবং তার বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যৎসামান্য আলোকপাতই এ নিবন্ধের প্রতিপাদ্য। লালনের গান যে কেবল চিত্তবিনোদনের বিষয় নয়; বরং তা এক মহতী সাধনার সহায়ক এবং মানবতাবোধের জাগরণে অন্যতম পথনির্দেশক-এ সত্যকে জনমানসে তুলে ধরাই গবেষণার উদ্দেশ্য।

গবেষণার পদ্ধতি

বর্তমান প্রবন্ধটিতে বিশ্লেষণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে আকরগ্রন্থ, সমালোচনা গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ব্যবহার করা হয়েছে।

মূল শব্দ

বাউল, লালন, চারচন্দ্র, অসাম্প্রদায়িক, মনুষ্যত্ববোধ, মানবতাবাদ

ভূমিকা

পঞ্চদশ শতকে বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে বাংলার ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। তিনি আচণ্ডালকে আলিঙ্গন করে তথাকথিত উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের বিভেদ ঘোচাতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি সমাজের ছোটোজাত তথা অচ্ছুতদেরকে ছোঁয়াছুঁয়ির কবল থেকে রক্ষা করে তাদেরকে মানুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর মুখ থেকেই আমরা প্রথম 'বাউল' নামক একটা শ্রেণির কথা শুনতে পাই । যারা পরবর্তিতে সতের শতকের দিকে বিকশিত হয় এবং আঠার শতকে এসে মহাত্মা লালনের চিন্তা-ভাবনায় পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। লালন নিজে ছোঁয়াছুঁয়ির কবলে পড়েছিলেন। যৌবনে স্বজাতিয়দের সাথে তীর্থক্ষেত্র দর্শন করে বাড়ি ফেরার পথে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলে সঙ্গীরা যখন মুমূর্ষু লালনকে ত্যাগ করে যান, তখন জনৈক হাফেজ মলম শাহ কারিগরের স্ত্রী মতিজান বিবির পরিচর্যায় তিনি সুস্থ হন। পুনর্জীবন লাভ করে লালন বাড়ি ফিরে যান। কিন্তু মুসলমান ফকিরের সেবা-শুশ্রূষা ও অন্ন-জলে প্রতিপালিত হওয়ার দোষে তাঁকে সমাজচ্যুত করা হয়। অগত্যা তিনি মলম শাহের কাছে ফিরে আসেন এবং তাঁর গুরু সিরাজ সাঁই এর নিকট ফকিরি মতে দীক্ষিত হন। হিন্দুসমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় লালন ব্যথিত হয়েছিলেন। প্রচলিত ধর্মমত ও সাধন পদ্ধতি সমূহের ওপর তাঁর বিতৃষ্ণা জাগে। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে প্রথাগত অনুশাসন সম্পর্কে লালন বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। কিন্তু কোনো ধর্মই নিষ্ঠার সাথে পালন করেন নি। তাঁর ধর্মীয় দর্শন বৌদ্ধ দর্শন, সুফিবাদ, বৈষ্ণব সহজিয়া মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তিনি নিষ্ঠার সাথে এসব মত মান্য করেন নি। তিনি বৌদ্ধ সহজিয়া মতকে আশ্রয় করে ইসলামের মরমীতত্ত্ব সুফিবাদ ও শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণববাদী প্রেমতত্ত্বের সমন্বয়ে একটা স্বতন্ত্র ধর্মমতে উপনীত হন। এই ধর্মমত হলো 'মানবধর্ম', যা পরকালের অনিশ্চিত শান্তি প্রত্যাশার চেয়ে ইহজাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বেশী গুরুত্বারোপ করে। মানবধর্মের অনুশীলনের জন্য তিনি রচনা করেন প্রায় পাঁচ শতাধিক ভাবসঙ্গীত, যা লালন সঙ্গীত বা লালনগীতি নামে পরিচিত। এই সঙ্গীতের মধ্যেই লালনের ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন নিহিত। প্রসঙ্গক্রমে লালনের দর্শনের অন্যতম উপাদান 'মানবতাবাদ' নিয়েই এ নিবন্ধের আলোচনা ।

বিশ্লেষণ

'বাউল' দর্শন বাঙালির দর্শন। এ দর্শন বাংলার মাটিতে তথা বাঙালি মননে উদ্ভূত, লালিত ও বিকশিত, বিধায় বাঙালির একান্ত নিজস্ব সম্পদ। "বাংলার এক শ্রেণীর অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, একতারা আশ্রয়ী ভাবোন্মত্ত গায়ক, স্বাধীন ও সমন্বয়মূলক মরমী সাধকের নাম বাউল।"[১] "বাউল মত বাংলার ধর্ম, বাঙালির ধর্মী

একান্তভাবে বাঙালির মানস ফসল।"[২] 'বাউল শব্দটির আদি প্রয়োগ লক্ষ করা যায় পনের শতকের শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে এবং ষোল শতকের শেষের দিকে চৈতন্যচরিতামৃতে। সেখানে শব্দটিকে 'ক্ষেপা' ও 'বাহ্য জ্ঞানহীন অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।'[৩] অনেকের মতে, "বাতুল শব্দ থেকে বাউল শব্দটির উদ্ভব। আবার অনেকের মতে বাউল এসেছে ব্যাকুল শব্দ থেকে। যারা আত্মানুসন্ধানে ব্যাকুল তারাই বাউল। বাউল মতে হিন্দু, মুসলমান উভয় শ্রেণির লোকই আছে। যদিও বিশেষ কোনো ধর্মীয় চেতনা এ মতবাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। আত্মারূপী পরমেশ্বরকে মানবদেহে উপলব্ধি করাই হলো বাউল সাধনার লক্ষ্য। মানবদেহকে সকল তত্ত্ব ও সত্যের ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করে বাউলরা ঘোষণা করেন, দেহই কৈলাস বৃন্দাবন, দেহই মক্কা-মদিনা', 'যাহা আছে দেহভাণ্ডে, তাহাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে' প্রভৃতি। (আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, পৃথিবী যে ৯২টি মৌলিক উপাদান দ্বারা গঠিত, তার মধ্যে ৬১টি উপাদান দ্বারা আমাদের শরীর গঠিত।)"[৪] বাউল মতে, মানবাত্মার মধ্যেই পরমাত্মা, আলেখ সাঁই বা মনের মানুষের অধিষ্ঠান। বাংলাদেশে মরমি দর্শন বিকাশে সুফিতত্ত্বের পরই বাউলতত্ত্বের অবস্থান ।

বাউল দর্শনের ভিত্তি হলো বাউল সঙ্গীত। এ সঙ্গীত তাত্ত্বিকতায় পরিপূর্ণ। স্বশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত লোকদের রচনা বিধায় এ সাহিত্য লোকসাহিত্যের উপর উঠতে না পারলেও এর দার্শনিক গভীরতা আদৌ কম নয়। 'অধ্যাত্ম সাধনায় উজ্জীবিত এসব সাহিত্য ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালিকে তথা সত্যিকার মানুষকে দেখার একটি মহান প্রয়াস।'

বাউলতত্ত্বের বিকাশ ঘটে মধ্যযুগে। সতের শতকের দ্বিতীয় পাদে মুসলমান মাধববিবি ও আউল চাঁদের হাত ধরে নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্রের নিকট বাউল মতবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তবে এ তত্ত্বকে যিনি সর্বাধিক জনপ্রিয় করে তোলেন, তিনি হলেন ফকির লালন শাহ্। অষ্টাদশ শতকের লালন শাহই হলেন বাউল সম্রাট, তথা বাউল শিরোমণি। মহাত্মা লালন তাঁর সঙ্গীতের মধ্য দিয়েই তাঁর মতাদর্শ প্রকাশ করেন। তাই বাউল দর্শন ও লালন সঙ্গীত অবিচ্ছেদ্য। লালনের অনবদ্য সৃষ্টি লালন সঙ্গীতের মাধ্যমেই বাউল মত জনপ্রিয় হয় এবং দার্শনিক স্বীকৃতি অর্জন করে। বাউলের কাছে গান আর জ্ঞান সমার্থক। জ্ঞান হচ্ছে আরাধনা। বাউলরা ভক্তিতে-বিনয়ে-প্রেমে গান করার মাধ্যমে জ্ঞানচর্চা করেন।

বাউল মতানুসারে আত্মা পরমাত্মার অংশ। দেহাধারাস্থিত আত্মাকে জানাই বাউলের ব্রত। লালন তা প্রকাশ করেন এভাবে :

> 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়
> ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায় ॥'[৫]

উল্লেখ্য, বহুলশ্রুত এই গানটি বিবিসির জরিপে সর্বকালের ২০টি বাংলা গানের তালিকায় ১৪তম স্থান পেয়েছে। গানটিতে বর্ণিত খাঁচা হলো দেহ আর অচিন পাখি হলো আত্মা; যাকে লালন মন-বেড়ী দিয়ে ধরে রাখার বাসনা করেছেন। এই প্রচেষ্টাই হলো আত্মানুসন্ধান। উপনিষদের ভাষায় যাকে "আত্মানংবিদ্ধি" বলা হয়েছে, সক্রেটিস যাকে বলেছেন, "নিজেকে জান" (know thyself); সেই নিজেকেই জানতে চেষ্টা করেছেন লালন। কারণ নিজেকে জানতে পারলেই পরমাত্মাকে জানা যায়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "যে নিজের 'নফস'কে অর্থাৎ

প্রাণশক্তি বা চালিকা শক্তিকে জানতে পারে সে তার রবকে জানতে পারে" (মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু)। আত্মানুসন্ধানী লালন শাহ ছাড়াও বাউল কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : শেখ মদন, গঙ্গারাম, পাগলা কানাই, পাঞ্জু শাহ, পদ্মলোচন (পোদো), যাদু, দুদ্দু, পাঁচু, চড় গোঁসাই, গোলাম গোঁসাই, চণ্ডী গোঁসাই প্রমুখ। এঁরা একাধারে কবি, দার্শনিক, ধর্মবেত্তা ও মরমি। তাঁদের গান কেবল লোকসাহিত্য হিসেবে নয়, বরং বাঙালির প্রাণের কথা, বাঙালি মনীষার ফসল ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর।

বাঙালিকে চিহ্নিত করা হয় সংকর জাতি হিসেবে। কারণ, বাঙালির রক্তে সংমিশ্রিত হয়েছে অস্টিক, দ্রাবিড়, নেগ্রিটো, আর্য প্রভৃতি গোষ্ঠীর রক্তপ্রবাহ। তবে ডঃ আহমদ শরীফ মনে করেন, এদেশে (বাংলাদেশে) অবিমিশ্র আর্য প্রভাব কোনোদিন পড়েনি। তাঁর মতে, গুপ্ত ও সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখা দিলেও পাল আমলে বেদ' বিরোধী বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম হয়। তন্ত্র, যোগ প্রভৃতি সাধন পদ্ধতিকেও পণ্ডিতরা অবৈদিক বলে মত দিয়েছেন। A. E. Gough (মাধবাচার্য্যের "সর্বদর্শনসংগ্রহ" গ্রন্থের সহ অনুবাদক) বলেন, 'স্থানীয় অনার্য অধিবাসীদের কাছ থেকেই বৈদিক আর্যরা কালক্রমে যোগ-সাধন পদ্ধতিটা গ্রহণ করেছিল।'[৬] পাঁচকড়ি ব্যানার্জী বলেন, 'তন্ত্র অতিপ্রাচীন, তন্ত্র ধর্মই বাঙালির আদিম ধর্ম এবং ইহা অবৈদিক ও অনার্য।'[৭] সুতরাং অনার্য লোকায়েতিক জড়বাদ তথা জাগতিকতার সঙ্গে যোগ ও তন্ত্র সাধনার মতো দেহাত্মবাদ, অবৈদিক পূজা-অর্চণা, বৈদিক অধ্যাত্মবাদ ও পারলৌকিকতা প্রভৃতি বিপরীতধর্মী মতবাদে সমৃদ্ধ হয়েছে বাঙালির মনন-সাধনা। আর মধ্যযুগের বৈষ্ণব বাউল লোকসাহিত্য ও গীতিকবিতায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাধক ও দার্শনিক কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রচার করা হয়েছে স্রষ্টা, সৃষ্টি ও রহস্যময় মানবজীবন সম্বন্ধে সাবলীল জিজ্ঞাসা, উদার পরিসরে প্রোথিত হয়েছে সাম্য ও প্রেমের সুউচ্চ মিনার। আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের সাহিত্যাকাশে তা বিশালতর হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লালনের গানে প্রভাবিত হয়ে প্রবাসী পত্রিকার 'হারামণি' বিভাগে লালনের কুড়িটি গান প্রকাশ করে সুধীজন সমক্ষে তাঁকে তুলে ধরেন। এছাড়া তিনিই প্রথম, যিনি লালনের ২৮৯টি গান সঙ্কলন করেন এবং বাউল দর্শন নামক খাঁটি দেশীয় দর্শনকে বিশ্বসভায় পরিচিতি দেন ।

বাউলরা মানুষের মধ্যে ভেদ-অভেদ স্বীকার করে না।[৮] তাঁরা মানুষকে কোনো শাস্ত্রের অধীন করতে চায় না। সে শাস্ত্র মানুষের তৈরি হোক বা ঈশ্বর প্রদত্ত হোক। তাই তাঁরা হিন্দু-মুসলিম, বেদ-কুরানের পার্থক্য রচনা করেন না। তাইতো দেখা যায় বাউলদের মধ্যে রয়েছে হিন্দু গুরুর মুসলমান শিষ্য, আবার মুসলমান গুরুর হিন্দু শিষ্য।

বাউলদের সাধন পদ্ধতি প্রধানত দেহতাত্ত্বিক যা তন্ত্র থেকে উদ্ভূত। বাউলদের সাধন পদ্ধতি ও হিন্দুতন্ত্রের সাধন পদ্ধতি প্রায় অভিন্ন। হিন্দুতন্ত্রে সহস্রারে শিবত্ব উপলব্ধি হয়। আর বাউল সাধনায় 'সহস্রারে' যে পরমসত্তার সন্ধান পাওয়া যায় তার নাম দেওয়া হয়েছে 'পরমেশ্বর', 'মনের মানুষ', 'রসের মানুষ', 'অটল মানুষ' 'সহজ মনুষ', 'অধর মানুষ' 'অলখ সাই', 'অচিন পাখি' প্রভৃতি। বাউলরা বিশ্বাস করেন যোগসাধনার মাধ্যমে দেহকে ইচ্ছাধীন করা সম্ভব ।

বাউলরা শাস্ত্রকে যেমন অগ্রাহ্য করে তেমনই যুক্তিতর্কের অবতারণাতেও তাঁদের অনীহা লক্ষণীয়। তাঁরা

পরমসত্তা বা সাঁইকে মন দ্বারা উপলব্ধি করে। দেহসাধনার মাধ্যমে মন ও দেহের সম্মিলনে চরম অবস্থায় উন্নীত হলেই এই উপলব্ধি সম্ভবপর হয়। এই সাধনা বলে বাউল অতিক্রম করেন বস্তুর প্রচলিত রূপের জগৎ এবং উপনীত হন এক তন্ময়াবস্থায়, সেখানে তিনি কার্যত হয়ে পড়েন 'জ্যান্তে মরা' এবং প্রত্যক্ষ করেন পরমসত্তার স্বরূপ। এই মরমিবাদী বৈশিষ্ট্যের কারণে বাউলতত্ত্বে সুফিবাদের প্রভাব রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয় । সুফিদর্শনে পরমাত্মার সঙ্গে অসীম সত্তার এই মিলনকেই বলা হয় ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহ ।

বাউল দর্শনে মানুষের গুরুত্ব বিশেষভাবে, বিশেষ অর্থে গ্রথিত হয়েছে। বাউল মতবাদে মানুষকেই মানুষের মুক্তিদাতা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। কোন ঈশ্বর বা দেব-দেবীর নিকট তারা মুক্তির পথ খোঁজেননি। এটাও তাদের সংগ্রামী জীবনের ফসল। বাউলরা ছিল সমাজের নিম্নশ্রেণির লোক। সমাজের নীচুতলার মানুষ (হাঁড়ি,মুচি, ডোম, মেথর, তাঁতি, জোলা, বেহারা) যখন মানুষ হয়ে উঠতে পারছিল না, তথাকথিত উচ্চবর্ণের সমাজ-উঁচুতলার মানুষ তাদেরকে যখন স্বীকার করছিল না, কোনো ধর্মের আশ্রয় লাভও যখন তাদের মুক্তির পথ দেখায়নি তখন সমাজের এই হতভাগ্য মানুষগুলো তাদের মুক্তির পথ খুঁজেছেন কোনো নতুন পথ ও মতের মধ্যে। তাদের অবহেলিত, লাঞ্ছিত সংগ্রামী জীবনের অভিজ্ঞতা তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মাতে সাহায্য করেছে যে, সমাজের উঁচুতলার মানুষ হতে শুরু করে কোন দেবদেবী বা ঈশ্বর তাদের ভালো মন্দ দেখেননি। তাদের ভাষায় 'মানুষ গুরু' মানুষই তাদের মুক্তির পথ দেখিয়েছেন, এই মানুষ তাদের সমাজের মতো মানুষ। বাউলের কাছে মানুষ তাই এত গুরুত্বপূর্ণ, মানুষ ছাড়া মানুষের মুক্তি নেই। বাউল তাই বিশ্বময় মানুষ দেখতে পান, দেখতে চান। লালনের ভাষায়–

> "যথা যাই মানুষ দেখি
> মানুষ দেখে জুড়াই আঁখি।"[৯]

এভাবে বাউলদের নিকট ধর্মের চেয়ে মানুষ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। উপাসনালয়ের চেয়ে মানবদেহকে তারা বেশি পূজ্য ভেবেছেন। উত্তরকালের কবি নজরুলও বলেছেন, 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান', বা 'এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নাই'। বাউলদের মানবপ্রীতি বা মানবদরদি দিকটির যে মহান দার্শনিক তাৎপর্য রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বর্তমানে যাকে 'secular humanism' বা 'secular thought' বলা হয় বাউল দর্শনে তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ ঘটেছে।

বাউল শিরোমণি লালনকে সন্ধান করতে গেলে ফাঁপরে পড়তে হয়। প্রশ্ন জাগে- কে এই লালন, কী তাঁর পরিচয় অথবা কেমন তাঁর ধর্ম-জীবন? মানুষের মতামতের যেমন শেষ নেই, তেমনি গবেষকরাও তাঁর সব বিষয়ে একমত পোষণ করেননি। লালনের জন্ম-পরিচয় নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। লালন গবেষকদের একাংশের মতে, তিনি মুসলমান বংশোদ্ভূত এবং তাঁর জন্ম বর্তমান ঝিনাইদহ জেলার হরিশপুর গ্রামে। কিন্তু অধিকাংশের মতে, তাঁর জন্ম হিন্দুকুলের কায়স্থ পরিবারে এবং জন্মস্থান কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালির ভাঁড়ারা গ্রামে। লালনের জন্ম ১৭৭২ মতান্তরে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে। দীর্ঘায়ু লালন যৌবনে সিরাজ সাঁই এর নিকট ফকিরি মতে দীক্ষা লাভ করেন। হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে যেসব কিংবদন্তি প্রচলিত আছে, তা নিয়ে গবেষণা চলমান। সম্প্রতি তাঁর গান নিয়ে দেশে-বিদেশে অধিকতর গবেষণা হচ্ছে। লালনের কণ্ঠে

ধ্বনিত হয়েছে মানবতার জয়গান। তিনি আত্মজ্ঞানের মধ্য দিয়ে যে অমৃতের সন্ধান করেছেন, তাঁর অনুসারীরা তাঁর গানের মধ্য দিয়েই সেই অমৃতের সন্ধান খুঁজে পান ।

ফকির লালন শাহ স্বয়ং মহা ভাবসমুদ্র। তিনি মাতৃযোনি সম্ভূত সাধারণ মানব সন্তান হলেও একটি আদর্শিক ভাবধারা নিয়ে দার্শনিকতার জগতে আত্মমুক্তির এক বিশেষ পন্থায় জীবন পরিচালনার মহামন্ত্র প্রচার করে গিয়েছেন। তখনকার ধর্মভিত্তিক খণ্ড-বিখণ্ড সমাজ ব্যবস্থাকে ঐক্যসূত্রে বাঁধার পরিকল্পনার মহাপ্রয়াস নিয়ে লালন শাহ সমাজে যে বিশেষ একটি ভাবদর্শন তৈরী করেছিলেন, মূলত সেটাকেই লালন দর্শন বা বাউল-দর্শন অভিধায় আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

শ্রেষ্ঠ বাউল হিসেবে লালনের যে দর্শন, তা অনেক ব্যাপক-বিস্তৃত। তাঁর সঙ্গীতে সন্নিবেশিত হয়েছে আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, গুরু বা মুর্শিদতত্ত্ব, প্রেম-ভক্তিতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, মানবতাবাদ ইত্যাকার নানাবিষয়। বৌদ্ধ সহজিয়া মত, সুফিবাদের মরমীতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণবীয় প্রেমতত্ত্ব প্রভাবিত লালন দর্শনে যে মানবতাবাদের বিকাশ ঘটেছে তা আলোচনার পূর্বে মানবতাবাদ বলতে কী বোঝায় এবং এ মতবাদের ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা আবশ্যক।

সাধারণত 'মানবতাবাদ' বলতে মানবকেন্দ্রিক দর্শনকে বুঝায়। মানবতাবাদ হলো এমন এক বিশেষ দার্শনিক মতবাদ, যাতে সমাজ জীবনের যাবতীয় বিষয়ের বিচার-বিবেচনায় মানুষকেই করা হয় কেন্দ্রবিন্দু এবং মানুষের শক্তি, সত্তা ও গুণসমূহ প্রাধান্য পায়। এ মতবাদে মানুষের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে বলা হয়, মানুষ অন্যকিছুর ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং অন্য সবকিছুই মানুষের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ নিজে তার ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণকর্তা। আত্মোন্নতির দ্বারা মানুষ নিজের, সমাজের, জগতের কল্যাণসাধন করতে পারে। কাজেই মানবতাবাদ হলো এমন এক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা মানুষের সৃষ্টিধর্মী ক্ষমতা, স্বাধীনতা ও কল্যাণের পথ নির্দেশ করে।

দর্শন ভাবনায় মানবতাবাদের ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং প্রবহমান। পাশ্চাত্যে খ্রিস্টপূর্ব যুগের প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীর সমকালীন দর্শনেও এ দৃষ্টিভঙ্গি বিস্তৃত। গ্রিক দর্শনে মানবতাবাদী চিন্তার উদ্ভব লক্ষ করা যায় সোফিস্টদের দর্শনে। সোফিস্ট শিরোমণি প্রটেগোরাসের বক্তব্য 'Man is the measure of all things' অর্থাৎ 'মানুষ সবকিছুর পরিমাপক' এ উক্তির মধ্যেই সোফিস্টদের মানবতাবাদের বীজ নিহিত। তাঁরা উত্তরকালের মানুষদের জন্য এ শিক্ষাই রেখে যান যে, প্রকৃতি নয়, মানুষ নিজেই তার কৃতকর্মের মানদণ্ড এবং সে নিজেই তার চিন্তার প্রথম ও শেষ সমস্যা। সোফিস্ট পরবর্তী সক্রেটিস, প্লেটোর মানবতাবাদের অনুসরণ করে মধ্যযুগের ব্রিটিশ দার্শনিক জন উইক্লিফ (John Wycliffe, 1320-1384) ধর্মযাজকদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে নিজের জীবনের ঝুঁকিকে মাথায় নিয়ে মধ্যযুগীয় নির্বিচারবাদ ও চার্চীয় কর্তৃত্বের সমালোচনা করে তাঁর মানবতাবাদী মতবাদ প্রচার করেন ।

মধ্যযুগীয় চার্চবাদের পতনের পর চৌদ্দ শতকের শেষভাগ থেকে শুরু করে ষোল শতক পর্যন্ত পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে নতুন উদ্দীপনা দেখা দেয়, যা 'রেনেসাঁ' (নবজাগরণ) নামে খ্যাত, সেই 'রেনেসাঁ'র পথিকৃৎদের চিন্তা-ভাবনা তথা আধুনিক যুগের ধ্যান-ধারণায় মানবতাবাদের প্রচার ও প্রসার লক্ষণীয়। এরপর সমকালীন

পাশ্চাত্য দর্শনে মানবতাবাদ এক নতুন মাত্রা পায়। এসময় যাঁরা মানবতাবাদের ঝাণ্ডা নিয়ে দৃপ্তপদে অগ্রসরমান তাদের মধ্যে বার্ট্রান্ড রাসেল এবং জ্যাঁ পল সার্ত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানবতার শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে পরিচালিত সংগ্রামে ব্রিটিশ দার্শনিক রাসেল ছিলেন একজন আপোষহীন সংগঠক। মানবতার স্থায়ী কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন তার জন্য তাঁকে চাকরী হারাতে হয়েছে, কারাবরণ করতে হয়েছে। তথাপি তিনি আদর্শচ্যুত হননি। আর ফরাসি দার্শনিক সার্ত্রে মানুষের মুক্তির সংগ্রামে এক নবযুগের সূচনা করে অস্তিত্ববাদী দর্শনকে মানবতাবাদী আন্দোলনে রূপান্তরিত করেন। মানবতার উদ্দেশে কথা বলেই তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করে যাননি, বরং চিন্তায়-কর্মে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, তাঁর দর্শন নিছক তত্ত্বদর্শন নয়, তাঁর দর্শন মানবতার মুক্তি আদায়ের, জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার, সমাজকে শোষণমুক্ত করার দিগ্দর্শন। অসহায়, নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানবতার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনার নিদর্শন হিসেবেই তিনি নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েও অবলীলায় তা প্রত্যাখ্যান করেন।

পাশ্চাত্যের ন্যায় প্রাচ্যেও বিশেষ করে ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকে মানবতাবাদের প্রকাশ লক্ষণীয়। মানবতাবাদের প্রথম সাক্ষাৎ বৈদিক যুগে। এ যুগের নাস্তিক বা অবিশ্বাসীরা বৈদিক সাহিত্যের তথা বেদে বর্ণিত প্রথম দিককার সূত্রগুলোর বিরোধিতা করে অর্থাৎ প্রাকৃতিক দেব-দেবীকে কেন্দ্র করে যে বৈদিক ধর্ম গড়ে উঠেছিল তার বিরোধিতা করে মানবতার জয়গান গেয়েছেন। আবার পরবর্তীতে বেদের উত্তরকাণ্ডের জ্ঞানকাণ্ড তথা উপনিষদে যে 'ব্রহ্ম'কে সচ্চিদানন্দ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আত্মা ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। এ কথায় মানুষকে এক উচ্চমার্গে স্থাপন করা হয়। উপনিষদে মানুষের মর্যাদা এবং তার কল্যাণবোধকে স্বীকৃতি দেওয়ায় অনেকে মনে করেন সম্ভবত উপনিষদেই সর্বপ্রথম মানবতার জয়গান গীত হয়েছে।

পরবর্তীতে মানবতার মুক্তির পথকে উন্মোচিত করে মানবতাবাদের চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে বৌদ্ধদর্শনে। তথাগত বুদ্ধের কাছে জীবের মুক্তি বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাঁর দর্শনে ঈশ্বর বা অতীন্দ্রিয় সত্তার কোন উল্লেখ নেই। জীবের মুক্তির জন্য জীব নিজেই যথেষ্ট। তার মানে বৌদ্ধদর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল মানুষ ও মানুষের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা, কোনো অতিপ্রাকৃত সত্তার পূজার্চনা নয়। মানুষ এক বিরাট সম্ভাবনাময় সত্তা, সে যে নিজেই সবকিছু করার অধিকার রাখে এ কথা সম্ভবত বুদ্ধই সর্বপ্রথম গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, অন্তত প্রাচ্যের দর্শনে ।

তথাগত বুদ্ধের উপলব্ধিরই প্রকাশ লক্ষণীয় মধ্যযুগের (চতুর্দশ শতকের) কবি চণ্ডীদাসের প্রবাদতুল্য উক্তি- "সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই"-এ পঙক্তিতে। কবি চণ্ডীদাসের এই প্রকাশ শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব দর্শনে যেমন বিশেষভাবে প্রতিফলিত, তেমনই তার চরম বিকাশ ঘটেছে বাউলদের 'চারিচন্দ্রভেদ' (রজঃ, শুক্র, মূত্র ও মল) সাধন প্রণালিতে। তাঁদের মতে, মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, বিধায় মানুষের কোন অংশই অপবিত্র নয়। তারা বিশ্বাস করেন, চারিচন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমেই সাধক-সাধিকার উভয়ের দেহ পরিপক্ব ও সাধনা পূর্ণ হয় ।

দীর্ঘকাল থেকে মানবতাবাদী মতবাদের দু'টি ধারা বহমান; একটি নিরীশ্বরবাদী এবং অপরটি ধর্মীয় বা

আধ্যাত্মিক। বাউল শিরোমণি লালনের মানবতাবাদী চিন্তায় অধ্যাত্মবাদের ছোঁয়া থাকলেও তা মূলত ইহজাগতিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ। লালন মানবীয় বিচ্যুতির সব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে, ব্যক্তিগত লোভ-লালসা-মোহ-হিংসা-দ্বেষ বর্জন করে, কেবল মানুষের সম্প্রীতির বাণীই তাঁর গানে প্রচার করেছেন। সমাজ সচেতনতার ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে তুল্য মূল্যে বিচার চলে এমন মানুষ পৃথিবীতে খুবই বিরল। বাঙালির এক শ্রেষ্ঠ সন্তান লালন আজ বিশ্বসমাজের মহান আদর্শ, প্রতীক-প্রতিমা। লালনের দর্শন ইতোমধ্যে জাতিসংঘের মাধ্যমে বিশ্বস্বীকৃতি লাভ করেছে। জাতিসংঘের ইউনেস্কো ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে বাউল দর্শন তথা লালন দর্শনকে 'A Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity' হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছে।

বাউল দর্শনে মানবতাবাদী চিন্তার ক্ষেত্রে লালন এক আইকন স্বরূপ। সমাজে প্রচলিত ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও জাতপাতের বিরুদ্ধে লালন তাঁর মানবধর্মের মতবাদ প্রচার করেছিলেন গানের মাধ্যমে। ধীরে ধীরে তাঁর সেই অহিংস মতবাদ ছড়িয়ে পড়ে দেশে-বিদেশে। বিশেষ করে সমাজের সাধারণ মানুষ শিষ্যত্ব নেন লালনের। তাঁর মাধ্যমে শুরু হয় নতুন এক মানবধর্মের চর্চা। জাত-পাতহীন, ধর্ম-বর্ণহীন সমাজের কথাগুলো লালনের গানের মূল কথা হওয়ায় মানুষ তাঁর গানের মাধ্যমে মানবমুক্তির আশ্রয় খুঁজে পায়।

লালনের মানবতাবাদী চিন্তার পেছনে একান্ত সহায় ছিল হাজার বছর লালিত বাংলার বৌদ্ধ উর্বর, সুফী উর্বর, বৈষ্ণব উর্বর সমাজমন। বিশ্বজগতের সৃষ্টির রহস্যময় আলো আঁধারির বিষয় নিয়ে এবং জীবনকে ঘিরে মানবমনে যত প্রকার মৌলিক প্রশ্নের উদয় হতে পারে লালনের তত্ত্বসংগীতে আমরা তা দেখতে পাই। সেদিক বিবেচনায় লালন সাঁইজি একজন ভাববাদী দার্শনিক। তবে তিনি মূলত যুক্তিবাদী কবি-দার্শনিক, বস্তুবাদের সমর্থক এবং সমাজবাদী।

লালনকে বিশ্লেষণ করতে হলে অবশ্যই তাঁর সমকালীন সমাজকে জানতে হবে। সমাজে যখন জাতিভেদ প্রথার ছোঁয়াছুঁয়ির কবলে পড়ে নিচুতলার মানুষ ঊনমানবে পরিণত হয়ে মুক্তির আকুতি নিয়ে আকুলি বিকুলি করছিল কিন্তু প্রতিবাদের অস্ফুট স্বর কণ্ঠ পেরিয়ে মুখে আসছিল না, লালন তখন এ জাতপাতের ওপর খড়্গ ধরেন এবং তাদের মুখে ভাষা দেন। তিনি বলিষ্ঠভাবে সমাজ আরোপিত জাতপাত অস্বীকার করে বলেন, "জাত গেল জাত গেল বলে একি আজব কারখানা / সত্য পথে কেউ নয় রাজি সবি দেখি তা না না না। যখন তুমি ভবে এলে / তখন তুমি কী জাত নিলে / কী জাত হবা যাবার কালে / সে কথা ভেবে বল না ॥"[১০]

লালনের গানে পাই বিশ্বজনীন বা সর্বজনীন মানব বন্দনার আহ্বান। তাঁর গানের মূল কথা হচ্ছে মানুষের কোনো 'জাত নাই'। জাত হাতে পেলে তা আগুন দিয়ে পোড়ানোর বাসনা করেছেন। এ কোনো আধ্যাত্মিক কথা বা কোনো কথার কথা নয়, এর মধ্যে রয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের আভাস। সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে থেকে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে অখণ্ড মানবতাবাদের প্রচারে লালন নিজের জাতি পরিচয় সম্পর্কে বলেছেন–

"সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে,
লালন বলে জেতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে ।
যদি সুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারীর তবে কি হয় বিধান,

বামন চিনি পৈতে প্রমাণ,
বামনী চিনি কিসেরে ॥"[১১]

স্পষ্টতই এখানে লালন 'জাতের নামে বজ্জাতি' কে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত ধর্মকে বিদ্রূপ করেছেন এবং বলেছেন মানবধর্মের কথা । মানবতার মহামন্ত্রে শ্রেণিবৈষম্যকে ভেঙে চুরমার করার প্রয়াস এখানে বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে । লক্ষণীয়,উনবিংশ শতকে জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) যুগে যুগে ধর্মতাত্ত্বিকরা ধর্মের নামে মানুষকে শোষণ করে বলে যে তত্ত্ব দেন, তার পূর্বেই লালন তাঁর বিভিন্ন গানে ধর্মের এই ক্ষতিকর দিকটি তুলে ধরেছিলেন। ধর্মতাত্ত্বিকদের ন্যায় সমাজপতিরাও ধর্মকে ব্যবহার করে জাতের নামে যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছেন তা লালনের মতে কোন শাস্ত্রের তো নয়ই, বরং তা মানুষের অজ্ঞতার ফসল । তিনি বলেন–

"জাত বলিতে কি হয় বিধান
হিন্দু- যবন বৌদ্ধ খ্রিস্টান
জাতের আছে কিবা প্রমাণ শাস্ত্র খুঁজিলে।"[১২]

সমাজে পোষাকী ধার্মিকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, কিন্ত যথার্থ ধার্মিক নিতান্তই নগন্য। ধর্মীয় আবরণে আচ্ছাদিত ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশের বাইরের দিকটা আতর-চন্দনে যতটা সুবাসিত, ভেতরটা ততোধিক দুর্গন্ধযুক্ত। অর্থাৎ ভিতর আর বাহির আলাদা। তাঁরা সাধু সেজে যাদু দেখায়। কেউ সত্যানুসরণ করে না। এমন কপটতার প্রেক্ষিতে লালনের আবেদন : "সত্য বল, সুপথে চল ওরে আমার মন / সত্য সুপথ না চিনিলে পাবিনে মানুষের দরশন।"

মানুষকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে লালন মানুষ ভজনের প্রাধান্য দেন। বলেন–

"মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি ।
মানুষ ছাড়া ক্ষেপারে তুই মূল হারাবি ॥"[১৩]

লক্ষণীয়, লালন দর্শনে 'মানব সেবা সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হয়েছে। মানুষের মধ্যে উত্তম সত্তা বর্তমান। এটাই লালন দর্শনে'মানুষ রতন'। এখানে এই মানুষকেই বলা হয়েছে 'সোনার মানুষ।' এই সোনার মানুষ হতে হলে 'মানুষ ভজন' করতে হবে। মানুষের জীবনে এটাই সবচেয়ে বড় কর্তব্য। এর চেয়ে বড় কিছু নাই।[১৪]

লালন ফকির গুরুবাদী মানবধর্মের প্রবর্তক। তাঁর সাধনার কেন্দ্রে রেখেছেন মানুষকে। বলেছেন :

"সহজ মানুষ ভজে দেখনারে মন দিব্যজ্ঞানে।
পাবিরে অমূল্য নিধি বর্তমানে, পাবি বর্তমানে ॥"[১৫]

আমরা যদি আমাদের সকল অহংকার-সংস্কার-আমিত্বকে বর্জন করে আমাদের দেখার দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে পারি তাহলে দেখতে পাই, মানুষ গুরুই মানুষের পথপ্রদর্শক, মানুষের মুক্তিদাতা। লালন বলেন–

"ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার
সর্বসাধন সিদ্ধি হয় তার ॥"[১৬]

লালনের গানে মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা, সমাজবাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর দর্শনের যে প্রতিফলন দেখা যায় তা দেশকালের গণ্ডী ছাড়িয়ে বিশ্বমানবিক মূল্যবোধের পরিচয় তুলে ধরে। তাই তিনি কেবল বাঙালি মরমি কবি বা গীতিকবিদের গণ্ডিতে আবদ্ধ নন, বরং বিশ্ব লোকসংস্কৃতির অঙ্গনেও তাঁর অবস্থান অনেক উঁচুতে। উপমহাদেশে বিদ্যমান হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে জাত-ধর্মের বাহ্যিক আচরণ ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিরুদ্ধে লালন ছিলেন প্রতিবাদী কণ্ঠ। তাঁর গান জাত-পাতের বিরুদ্ধে মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত হয়। গানে তিনি বলছেন, "একই ঘাটে আসা যাওয়া, একই পাটনি দিচ্ছে খেওয়া / কেউ খায় না কারও ছোঁয়া, বিভিন্ন জল কে কোথায় পান।"[১৭]

'জাতি' শব্দটি মূলত রাজনীতিবিজ্ঞানের একটি পরিভাষা। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-জৈন-খ্রিস্টান এসব ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা জীবন-সংগ্রাম বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজের সংস্কার-সংস্কৃতির কিছু উদাহরণ তুলে ধরে লালন জাতের অসারতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।[১৮] লালনের মতে, মানুষ এক জাতি। তাই স্বপ্ন দেখেছেন এক অখণ্ড মানবজাতির মহামিলনের। বলেছেন–

"এমন মানব সমাজ কবে গো সৃজন হবে
যেদিন হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ আর খ্রিস্টান, জাতি-গোত্র নাহি রবে ॥"[১৯]

লালনের এই গভীর আকুতি নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধিকে অতিক্রম করেছে। আর এজন্যই তাঁকে বলা হয় অসাম্প্রদায়িক মানবতার স্বপ্নদ্রষ্টা ।

যুগে যুগে যেসব কারণে মানবিকতা বিপন্ন হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম প্রধান কারণ হলো ধর্মীয় বিভেদজনিত সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতায় মানবিক মূল্যবোধ নষ্ট হয়। সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় এর ভাষায়, "প্রাকৃতিক দুর্যোগে মরে মানুষ আর সাম্প্রদায়িকতায় মরে মনুষ্যত্ব।" মনুষ্যত্ব লোপ পেলে মানুষের আর কীই বা অবশিষ্ট থাকে? লালন এটি অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। সেকারণে লালন এই সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে এক অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছেন। লালনোত্তর কালে তথা বর্তমান সময়ে আমরা যদি বিদ্যমান জাতিকুলের ভিন্নতা দূরীভূত করতে না পারি, যদি একই স্রষ্টার সৃষ্ট মানবরূপে নিজেদেরকে চিহ্নিত এবং প্রতিষ্ঠিত করতে না পারি, তাহলে যতই আমরা নিজেদেরকে অসাম্প্রদায়িক বলে দাবী করিনা কেন, যতই সাম্যের কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার লাইন- "মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান / মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ ॥"[২০] বলে উচ্চকণ্ঠ হই না কেন, কোনো সুফল বয়ে আনবে না। বরং অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতিসমূহের উপাসনালয়ে হামলা, ভাঙচুর আর পারস্পরিক হানাহানিতে প্রতিপক্ষের পৈশাচিকতায় রক্তের হোলিখেলা চলতেই থাকবে; বিপন্ন হবে মানবিকতা। সমাজের এমন প্রেক্ষাপট ও বাস্তবতায় লালনের অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ মানবতাবাদী দর্শন অনুধাবন এবং অনুশীলন অতীব প্রয়োজন।

উপসংহার

লালন তাঁর মানবতাবাদী দর্শনে একথাই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন যে, মানুষের মধ্যে কোনো জাতিভেদ নেই। মানুষ এক জাতি; মানুষ কেবল না হিন্দু, না মুসলমান, না বৌদ্ধ, না খ্রিস্টান কিংবা নয় অন্যকিছু। সে কেবলই মানুষ, আর সব মানুষ একই স্রষ্টার সৃষ্টি। সেইসাথে মহাবিশ্বের ছোট্ট ধরণীতে সৃষ্ট জীবকুলের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ। আমরা যদি নিজেদেরকে জীবকুলশ্রেষ্ঠ হিসেবে দাবী করি তাহলে মানবকল্যাণে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে, সব মানুষকে থাকতে হবে মিলিতভাবে। লালন সর্বদাই ইঙ্গিত করেছেন মানুষের মনুষ্যত্ব গুণের প্রতি। এ মনুষ্যত্ববোধকে যদি আমরা সর্বোচ্চ বিবেচনায় নিতে পারি তাহলে পারস্পরিক কলহ, হানাহানি, যুদ্ধ-সন্ত্রাস এমনকি রাষ্ট্রীয় আগ্রাসনও হয়তোবা একসময় বন্ধ হবে। পৃথিবীর সমস্ত শান্তিকামী মানুষ সেই সুদিনের অপেক্ষায় অপেক্ষমান। জয়তুঃ লালন।

তথ্যসূত্র

১. ড. মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, বাংলার বাউল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৩৭

২. ডঃ আহমদ শরীফ, বাউলতত্ত্ব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৪৬

৩. ডঃ আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৩৭৫

৪. ডা. অপূর্ব চৌধুরী-মানুষের শরীর কী দিয়ে তৈরী, ১৯ জুলাই-২০২২, বাংলাদেশ প্রতিদিন

৫. ডক্টর শ্রীমতিলাল দাস ও শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৫৮ লালন-গীতিকা, পৃ. ২০২, পদ-সংখ্যা-২৯১

৬. Philosophy of India, P-513-14, উদ্ধৃত: আহমদ শরীফ: বাউলতত্ত্ব

৭. উদ্ধৃত: আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, পৃষ্ঠা-১৮

৮. ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতে হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ পৃ. ২৮

৯. তৃপ্তি ব্রহ্ম, লালনের মানবতাবাদ ও অসাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি, লালন মৃত্যু-শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ১৫৬

১০. আবু ইসহাক হোসেন, বাউল দর্শন ও লালনতত্ব, পৃ. ২৪৯, গান নং-৪

১১. শ্রীবসন্তকুমার পাল, মহাত্মা লালন ফকির, আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, পৃ. ৩১

১২. আবু ইসহাক হোসেন, বাউল দর্শন ও লালনতত্ব, পৃ.২৮৪, গান নং-৬১

১৩. ডক্টর শ্রীমতিলাল দাস ও শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৫৮ লালন-গীতিকা, পৃ. ২৭১, পদ-সংখ্যা-৩৯১

১৪. ডক্টর খোন্দকার রিয়াজুল হক, লালন শাহ:জীবন ও অধ্যাত্মদর্শন, প্রবন্ধ, পৃ. ৬৫২

১৫. ফকির আনোয়ার হোসেন (সম্পাদিত), লালন-সঙ্গীত, ১ম খণ্ড, কুষ্টিয়া, ১৯৯৩, পৃ. ১৯৩, গান নং ১৯৩

১৬. আবু ইসহাক হোসেন, বাউল দর্শন ও লালনতত্ব, পৃ. ৩০০, গান নং-৮৫

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮, গান নং-২

১৮. অ্যাডভোকেট সিরাজ প্রামাণিক-লালন স্মরণোৎসব, ১৫ মার্চ-২০২২, বাংলাদেশ প্রতিদিন

১৯. আবু ইসহাক হোসেন, বাউল দর্শন ও লালনতত্ত্ব, পৃ. ২৭৫, গান নং-৪৬

২০. কাজী নজরুল ইসলামের গীতি গ্রন্থ 'সুর-সাকী'র গীত 'হিন্দু-মুসলমান', ফজলুল আলম পাপ্পু সম্পাদিত, আবৃত্তির কবিতাসমগ্র, হাতেখড়ি-২০১৫, পৃ. ১৯৭